The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 179-194
ISSN 2306-3920

পূর্ববাংলার প্রথম সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত ও জনমতের প্রতিফলন

মোঃ মনিরুজ্জামান*

[**সার-সংক্ষেপ :** সংবাদপত্রকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। এতে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো বিষয় নেই যা বর্ণিত থাকে না। পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের নাম *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। এ সংবাদপত্রটি বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা রংপুর থেকে ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালিন জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংবাদপত্রটির প্রকাশনা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন জারি করার ফলে নানাবিধ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের* প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের আদি সংবাদপত্রের আদ্যন্ত এবং নানা বিষয়ে এতে জনমতের যে প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।]

ভূমিকা

সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে রংপুরের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। রংপুর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বলে বিবেচিত। অনুসন্ধানের মাধ্যমে রংপুর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের যে তথ্য আমরা পাই তার সংখ্যা কম নয়। এর মধ্যে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র বলে বিবেচিত। কারণ এটিই পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। রাজধানী কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত রংপুর থেকে যে সেকালে পূর্ববাংলার প্রথম সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়েছিল তা কেবল আকস্মিক বা কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করার সুযোগ নেই। কারণ, আমরা জানি সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথমত উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক, দ্বিতীয়ত একটি শিক্ষিত সমাজ এবং সর্বশেষ একটি পাঠক সমাজ। বোধ করি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রংপুরে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ও সমর্থনকারী ছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং কতিপয় শিক্ষিত সমাজ। সে সময় কতিপয় জমিদার নিজেদের খ্যাতি প্রচার ও প্রসারের জন্যই কেবল সংবাদপত্র প্রকাশের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এমনটি মনে করা পুরোপুরি সঠিক নয়। বরং এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু জনকল্যাণ ও জনসচেতনতার ভাবনাটি নিহিত থাকতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং উক্ত সংবাদপত্রে জনমতের কি ধরনের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল তা আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

---

* **ড. মোঃ মনিরুজ্জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, ই-মেইল : mzamanbrur71@gmail.com

বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্ব ইতিহাস

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন উইলিয়াম বোল্টস নামক একজন ওলন্দাজ নাগরিক, যিনি ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী ছিলেন। কথিত দুর্নীতির অভিযোগে তিনি চাকরিচ্যুত হন এবং এক পর্যায়ে কোম্পানির সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এছাড়া কোম্পানির দুর্নীতি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে উইলিয়াম বোল্টস বেশ সোচ্চার ছিলেন। বাংলা অঞ্চলে কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক মানুষের ওপর কিরূপ নির্যাতন করা হয়েছিল তার একটি করুন চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। (জাহান, ২০০৮: ৪২)। উইলিয়াস বোল্টস জেমস অগাস্টাস হিকির *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হবার ১২ বছর পূর্বে ১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়াস চালান। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা একেবারে সূচনাতেই নাটকীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (পাল, ১৯৭২: ৩৫)। উইলিয়াম বোল্টসের প্রায় এক যুগ পর জেমস অগাস্টাস হিকি ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের শুভ সূচনা করেন। তিনি ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি শনিবার *বেঙ্গল গেজেট* বা *কলকাতা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (Chanda, 1987: 1)। পত্রিকাটি অবশ্য *হিকির গেজেট* নামেই বেশি পরিচিত ছিল। হিকির এ পত্রিকাটিই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালের পর ভারতে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু এবং হিন্দী যতগুলো খবরের কাগজ বের হয়েছিল তার সবগুলোরই আঁতুরঘর ছিল বাংলা। যার ফলে ভারতীয় জনমত গড়ে ওঠার পথটা সুগম হয়েছিল। *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশের ৩৮ বছর পর *দিগদর্শন* নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত মাসিক সাময়িকপত্র। পত্রিকাটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে জনক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় হুগলির শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় (Barns, 1940: 88)। কলকাতা শহরে নিকটবর্তী শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান মিশনারীরা যেমন আধুনিক বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি বাংলা সাংবাদিকতার পথিকৃৎ তারাই ১৮১৮ সালের দিকে একটি নিয়মিত বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। *দিগদর্শন* পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ সালের ২৩ মে *সমাচার দর্পণ* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক সংবাদপত্র হলো *সমাচার দর্পণ*। কারণ আধুনিক সংবাদপত্রের যেসকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার সবগুলোই *সমাচার দর্পণের* মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অনেক ধরনের খবর এবং জ্ঞানের কথা এতে ছাপা হতো। এর চিঠিপত্র কলাম সেকালের বাঙ্গালির জনমত প্রকাশিত হওয়ার এক আদর্শ জায়গার মর্যাদা অর্জন করেছিল (*Friend of India*, 1826:144)। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকলে তার সূত্র ধরে পূর্ববাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। আর এ উদ্যোগের শুভ সূচনা হয় পূর্ববাংলা তথা রংপুরের প্রথম সংবাদপত্র *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

***রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের* প্রকাশ ও আয়ুষ্কাল**

পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* একথা প্রায় নিশ্চিত। যা প্রাচীন ভূখণ্ড রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৫৪ সালের ভাদ্র (আগস্ট ১৮৪৭) মাসে রংপুরের কুণ্ডী পরগণার (যা বর্তমানে রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে এবং শ্যামপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত) শিক্ষানুরাগী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় রংপুর হতে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কালীচন্দ্র রায় প্রাথমিকভাবে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেও পত্রিকাটির মালিক ছিলেন এর সম্পাদক গুরুচরণ রায়। চার বছর পত্রিকাটি চালাবার পর গুরুচরণ রায় পরলোক গমন করলে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* এর মালিকানা ক্রয় করেছিলেন **(মামুন, ২০০০: ৪৩)**। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সম্পাদনায় ১৮৩১ সালের

২৮ জানুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা *সংবাদ প্রভাকর* যা আট বছর পর ১৮৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছে:

> সহযোগী ভ্রাতাদিগকে এবং করুণাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণকে যথা বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক আমি *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রের সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলাম।...অধুনা *বার্ত্তাবহ* প্রকাশের বিলম্বের কারণ বক্তব্য। এই পত্রের পূর্ব্ব সম্পাদক গুরুচরণ রায় গত ৩ ভাদ্র [১২৫৮] সোমবার দিবস পরলোক গমন করাতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীযুক্তা ভাগীরথী দেবী *বার্ত্তাবহ* যন্ত্রের তাবৎ বস্তু ও দেনা পাওনা ইত্যাদি সমুদয় আমার স্থানে বিক্রয় করেন (উদ্ধৃত, বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭২: ৯৫-৯৬)।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ প্রতি মঙ্গলবার বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির প্রকাশ ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন কুণ্ডী জমিদার পরিবারের কৃতি সন্তান *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৮৭৬-১৯৪৬)। তাঁর মতে, '*বার্ত্তাবহের (রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের*) স্থায়ীত্বকাল ছিল সাত বছর মাত্র। এ মন্তব্য থেকে একথা বলা যায় যে, *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকা (১৮৪৭-১৮৫৪) সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেন, পত্রিকাটি ছিল মফঃস্বল হতে প্রচারিত আদি সংবাদপত্র। কুণ্ডী জমিদার রাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় এর প্রবর্তক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এর জন্মের (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*) সঙ্গে সঙ্গেই রাজমোহন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরে তাঁর বাসস্থান সদ্যপুষ্করিণী হতে যন্ত্রালয় গোপালপুর গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানে পরম শিক্ষানুরাগী কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে *বার্ত্তাবহের* উন্নতি সাধিত হয় (রঙ্গপুর শাখা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী, দ্বিতীয় বর্ষ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত)।' কিন্তু ড. রতন লাল চক্রবর্তী ও সুশান্ত চন্দ্র খাঁ এর সম্পাদনায় *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে পত্রিকাটির প্রকাশ ও স্থায়িত্বকাল ৩ বছর অর্থাৎ (১৮৪৮-১৮৫১) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল তা সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীকে ভুলবশত কালীচরণ রায়চৌধুরী বলা হয়েছে (চক্রবর্তী ও খাঁ, ২০০১: VII)। Smarajit Chakraborti *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

> It was first published as a weekly in August 1847 under the patronage of Kalichandra Roychowdhury of Kundi Pargana, Rangpur. It was conducted by Gurucharan Roy. After his death Nilamber Mukhopadhayay became its editor. The paper took interest in the problems of the rural people. Female education was advocated in it. The publication of the weekly was discontinued from 1857 (Chakraborti, 1976: 202).

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন- 'রংপুর শহরের অনতিদূরে শ্যামপুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত *বার্ত্তাবহযন্ত্র* নামক মুদ্রাযন্ত্র। এই *বার্ত্তাবহযন্ত্র* ছাপাখানা থেকে ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাস (১২৫৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস) প্রকাশিত হয় *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। শুধু রঙ্গপুর নয়, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন সাময়িক পত্রিকা *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৭: ২৫)।' *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকা এবং এর সম্পাদক সম্পর্কে *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* যে বিবরণ আমরা পাই তা হলো- 'রঙ্গপুর কুণ্ডি হতে সে সময়ে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়ে *সংবাদ প্রভাকর* ও *ভাস্করাদির* প্রতিধ্বনিতে উত্তরবঙ্গ মুখরিত করতেছিল। স্বনামধন্য *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকার পরিচালক কবি কালীচন্দ্রের গুণমুগ্ধ হয়ে এক মাসের অধিক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে নৌকাযোগে কুণ্ডী নগরে উপস্থিত হয়ে কালীচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কবি কালীচন্দ্রের কাব্য প্রতিভা আজও বার্ত্তাবহ পত্রে লুকায়িত রয়েছে (রায় চৌধুরী, ১৯২৪: ৪৩)।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং (১৮১২-১৮৬২) মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক এক নিবর্তনমূলক আইন জারি করেন। এই আইনের ফাঁদে ফেলে ব্রিটিশ সরকার *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের* প্রচার বন্ধ করে দেয়। ১৭ আগস্ট ১৮৫৭ তারিখের *সংবাদ প্রভাকরে* প্রকাশ: শ্রাবণ ১২৬৪। ...ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রকাশ হবার পর *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্র বন্ধ হয়ে যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭২: ৯৬)। ১৮৫৭ সালের ১৩

জুন হতে ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন অর্থাৎ ১ বছরের জন্য সে সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৫নং আইন জারি করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। এ আইনে বলা হয়েছিল যে, 'রাজার অনুমতি ব্যতীত কোনো মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করলে অথবা তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র প্রকাশ করলে ৫,০০০ টাকা দণ্ড ও দু'বছরের কিছু কম কারাবাস করতে হবে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭২: ১৫৩)।' এ সময় পত্রিকাটির সম্পাদক আদালতে এসে বলেছিলেন যে তিনি আর পত্রিকা প্রকাশ করবেন না। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন চলার পর *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু

প্রাথমিক অবস্থায় *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* কলকাতার সংবাদপত্র হতে সংগৃহীত সংবাদই বেশিরভাগ পরিবেশন করতো। পরবর্তীকালে এটি স্থানীয় সংবাদ প্রকাশও শুরু করে। পত্রিকাটি সম্পর্কে তারাপদ পাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর থেকে প্রকাশিত প্রগতিবাদী মতাবলম্বী *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় স্থানীয় অভাব অভিযোগ ও সরকারি কর্মচারীদের দুষ্কর্ম ইত্যাদি সংবাদাদি প্রকাশিত হতো (পাল, ১৯৭২: ৮০)।' এ পত্রিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকতো বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* ব্রিটিশ সরকারের অনুগত জমিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। তাই শুরুতে পত্রিকাটি ছিল সরকারঘেঁষা এবং ভূস্বামীদের প্রশংসা করাই ছিল এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকার সাধারণ জনগণের ওপর নানা প্রকার গণবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে পত্রিকাটি এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার ওপর *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে* আলোকপাত করা হয়েছে (ইসলাম, ২০১১: ৪৭০)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সাহিত্য পরিষৎ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে সময়ে কলকাতা মহানগরীতে *সংবাদ ভাস্কর* ও *সংবাদ প্রভাকর* পূর্ণতেজে বের হয়, সেই সময়ে কুণ্ডীতে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রও সেইরূপ তেজে বের হয় (*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৯১৫: ১-১২)।' পত্রিকাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকারি নথিতে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'a weekly paper of news and extracts। এর প্রচার সংখ্যা ছিল ১০০ কপি এবং চাঁদার হার ছিল, বাৎসরিক ছয় রুপি (অগ্রিম দিলে চার রুপি) (Dompier: *Selections from the Records of the Bengal Government*, 1855: 112)।' সে সময় এ পত্রিকার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল কলকাতা থেকে ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত *সংবাদ প্রভাকর*। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসন ও জনমত, রাষ্ট্র, ভূ-স্বামী ও প্রজা, সমাজ ও ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং স্থানীয় অবস্থার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। জমিদারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অকুণ্ঠ সমর্থক। কিন্তু কুণ্ডির জমিদারের অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও ইংরেজদের প্রশস্তির পাশাপাশি সময়ে সময়ে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি (Dompier: *Selections from the Records of the Bengal Government*, 1855: IX)। ইংরেজদের দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল তা সত্যিই স্মরণীয় ঘটনা।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকায় সেকালের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা, বাল্য বিবাহ, সহমরণ তথা সতীদাহ প্রথা, নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা, কৌলিন্য, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা লক্ষ করা যায় ((*Selections from the Records of the Bengal Government*, 1855: XI)। সে সময়ে রংপুরে সমাজে নারী শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোড়ামী কাজ করতো তার কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাই ছিল পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষিত মেয়েদের স্বামীর জীবন দীর্ঘ হতো না এমন একটি কুসংস্কার সমকালীন রংপুরে

প্রচলিত থাকায় একজন লেখাপড়া জানা বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মেয়েকে সে সময় বিয়ে করা খুবই বিপদজ্জনক বলে গণ্য হতো (Vas, 1911: 135)।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে জনমতের প্রতিফলন

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিরাজমান ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর কৃষক বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ দানা বেধে উঠেছিল। পূর্ববাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হলো রংপুর। যেহেতু রংপুরের একটি বিরাট অংশ পূর্ববাংলার অন্তর্গত ছিল সেহেতু রংপুরের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাতেও আমরা সে চিত্র দেখতে পাই। এদিকে উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সমাজে যে নবজাগৃতির সূত্রপাত হয় তার বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারী মুক্তি আন্দোলন। এ সময়ে বাঙালি মেয়েদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সমাজে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়েছিল। শিক্ষার আলো থেকে শুরু করে বহির্জগতের প্রায় সমস্ত অধিকার থেকে মেয়েরা বঞ্চিত ছিল। অধিকার বঞ্চিত এসব মেয়েরা নানাবিধ অবিচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকে।

সামাজিক অবস্থা বিষয়ক জনমতের প্রতিফলন

(ক) স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীতা

উনিশ শতকের প্রারম্ভে নারী স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ছাড়াও নানাবিধ পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, 'স্ত্রীরা পুরুষের সমান অধিকার কিছুতেই পেতে পারেন না। যে স্থলে ভগবান তাদের কোনো বিষয়েই সমান ক্ষমতা দেননি, সে স্থলে তারা কিরূপে পুরুষের সমান ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আরোও বলেছেন যে, যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীরা জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন- যে প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা লাভ করে আধুনিক ভারতেও কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি রমণীরা অমরত্ব লাভ করে গেছেন- যে প্রণালীর শিক্ষা লাভ করে, ভারতের প্রতি নগরের, প্রতি গ্রামের, প্রতি গ্রহের অধিকাংশ রমণী দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার চরম সীমা প্রদর্শন করে গেছেন, আমাদের বর্তমান এ শোচনীয় অবস্থায় সে প্রণালীর শিক্ষা ভারত রমণীকে প্রদান করা কর্তব্য **(ঘোষ, ২০১৬: ৩৬৮)**।' স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধীতা করে মনু বলেন, 'যৌবনে পতি এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র একে রক্ষা করবে, যে পুত্র স্বামীর অবর্তমানে মাতার রক্ষক না হয় সে নিন্দনীয়। মনু যেসকল মাতা পুত্রের নিকট সুরক্ষিত নয় তাদেরকে শাসনবাক্যে এই বুঝালেন যে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই স্ত্রীকে কখনও স্বাধীন করবে না (ঘোষ, ২০১৬: ৩৬৮)।' আশ্চর্যের বিষয় *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের* কর্তৃপক্ষও নারী মুক্তি ও প্রগতির বিরুদ্ধে ছিল। সে সময় স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীতা করে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

> লেখা পড়া শিক্ষা করা কেবল অর্থোপার্জন উদ্দেশে, সুতরাং যাহার সেই অর্থের অপ্রতুল নাই, অথবা অপ্রতুল সত্ত্বেও যিনি ধনবান বন্ধু, বা কুটুম্ব, কিম্বা জাতির অনুকূলতার বলে সে অপ্রতুলকে গ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য করেন না, তাঁহার বিদ্যোপর্জনের কোন প্রয়োজন নাই। সাময়িক সুখ, অথবা দুঃখ, কিছুই চিরকাল থাকে না, অতএব সুখ হইতে এককালীন আপনাকে বঞ্চিত করিয়া, এবং সাধ্য পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সভার মধ্যে বক্তৃতা করা, বা কোন প্রকার সাজাইয়া লেখা শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই, যেহেতুক তাহা করণ দ্বারা আশু অর্থোপার্জন কিছু হয় না। স্ত্রী জাতির বিদ্যা শিক্ষার বিষয়েও ঐ কথা, অর্থাৎ তাহারা কখনো প্রকাশ্য... কর্ম্ম করিতে সমর্থা হইবে না, বরং ...

> শিক্ষা করিলে তাহারদিগের দুষ্ট মন আরো অধিক বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং তাহার প্রয়োজন নাই (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৭ মে ১৮৫১)।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পাঠে অনুধাবণ করা যায় যে, পত্রিকাটি ছিল একটি রক্ষণশীল পত্রিকা। পত্রিকাটির এক প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষার বিপক্ষে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা হলো- পিতা কন্যাকে সযত্নে পালন করবেন, যথারীতি শিক্ষা দিবেন, পরে যোগ্য বরে সমর্পণ করবেন। বালিকাদের বিদ্যালয়ে গমন ও সাধারণ শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন হিন্দু সভ্যতা অনুমোদিত নয়। পিতা-মাতা অধীনে চরিত্র রক্ষাপূর্বক বিদ্যা শিক্ষাই উৎকৃষ্ট পন্থা। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ফলে নির্লজ্জতা বৃদ্ধি পায় ও কলঙ্ক স্পর্শের শঙ্কা থাকে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে রমণীর মাতৃভাব সঙ্কুচিত হয়। প্রধানত গর্ভধারণ ও প্রসবের ফলে নারী দেহের স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্ত হয়। তাছাড়া মস্তিষ্কের শ্রম বেশি হলে স্নায়ুবিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় ও দেহ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য নারীকূলে উচ্চ শিক্ষা ও যৌবনের প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ লক্ষ করা যায়। এটি গর্ভধারণে বাধা হচ্ছে, সন্তান পালনে অনিচ্ছা জন্মাচ্ছে এবং স্তনে দুগ্ধাল্পতা ঘটাচ্ছে। সংবাদপত্র থেকে আমরা আরও জানতে পারি:

> প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালীও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা স্থানে স্থানে 'বালিকা বিদ্যালয়' নামে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ও হইতেছে। উহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পুরুষদিগের হস্তে ন্যাস্ত। বালিকাগণ সাধারণতঃ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এ প্রণালী বিশুদ্ধ নহে। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সচ্চরিত্রা মহিলাদিগের প্রতি অর্পিত হওয়া উচিত। যাহার স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, অবিলম্বে স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা বিধান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া প্রার্থনীয় নহে (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৭ মে ১৮৫১: ২৯)।

(খ) বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ক জনমত

বাল্যবিবাহ হলো দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত একটি সামাজিক কুপ্রথার নাম। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ছিল অতি পরিচিত একটি ঘটনা। মেয়ের মুখে বুলি ফোটার আগেই অনেক সময় তাকে পাত্রস্থ করা হতো। কোলে করে বা ধামায় বসিয়ে পাত্রীকে বিবাহ সভায় এনে সম্প্রদান করা হচ্ছে- এমন খবর উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে যে দেহ হয় শক্তিহীন, এই বিবাহজাত সন্তান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল ও বীর্যহীন হয় তা উনিশ শতকের প্রারম্ভেই বাঙালি সমাজের সচেতন মানুষজন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং এই কারণেই এই প্রথার বিরুদ্ধে সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশে তারা সচেতন ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪) বাল্যবিবাহের মতো একটি কুপ্রথা অবসানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল আকার ধারণ করে। এ বিষয়ে কৈলাসবাসিনী দেবী উল্লেখ করেছেন যে, 'এই বাল্যবিবাহ যে অতি অনিষ্টের মূল তা কারো অজানা নেই, এই বাল্যবিবাহই আমাদের দুর্ভাগ্যের সোপান স্বরূপ! হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ! তোমরা আগে এ ক্ষতিকর বিষয়টি নষ্ট করে সাধারণের কষ্ট দূর কর, পরে অন্য বিষয়ে হাত দেবে। আহা! আমাদের দেশে যদি এ বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকতো তাহলে আমাদের এ দেশে যে কতো সুখ বিরাজ করতো তা বলা যায় না (দেবী, ১৮৬৩: ৩৮)।' বাল্যবিবাহ সম্পর্কে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক হয়, সে দেশীয় লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অতএব অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত। যাবৎ পরিবার প্রতিপালন ও সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দানের উপযোগি অর্থ সংগ্রহ বা তাহার উপায় ধার্য্য

> না করিতে পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে! যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রী গ্রহণ করে, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকাল মৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক সংখ্যা হ্রাস হয় (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৯ অক্টোবর ১৮৫০)।

(গ) সুরাপানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ

তৎকালিন সমাজে সুরাপান ছিল উঁচুস্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। এ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রায় সব পত্রিকাই একমত হয়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিল। সুরাপান নিবারণের জন্য সভা-সমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং এ সংক্রান্ত নানা তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদেশের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে সুরাপান করা হয় না। এই কুঅভ্যাস দূর করতে না পারলে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং এর মূলোৎপাটন করার জন্য সে সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র তাদের প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিল। *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ* সংবাদপত্র সুরাপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছিল নিম্নরূপেঃ

> সম্প্রতি সুরারূপ বিষ বৃক্ষের শাখা বঙ্গ দেশের প্রায় সকল স্থানেই বিস্তৃত হইতে লাগিল এতদ্দেশের মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে দুই একটী করিয়া সুরার দোকান লক্ষিত না হইয়া থাকে। মাদকের এইরূপ বহুল প্রচার বশতঃ আমরা দেখিতেছি, অধুনা প্রায় অধিকাংশ ইতর লোকেই মদ, গাঁজা এবং আফিমের চেলা হইয়া চোর, ডাকাইত ও লম্পট হইয়া উঠিতেছে এবং অধিকাংশ ভদ্রলোকেই আজ-কাল মাদকের দাস হইয়া সংসার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সতত বেশ্যা সেবায় নিযুক্ত হইতেছেন। সুরার প্রাদুর্ভাবে দিন দিন এতদ্দেশে এই রূপ যে কত কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন, ফলতঃ ইহার মূল উৎপাটিত না হইলে আর কটা দেশীয় লোকের মূল্য নাই (*রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮)।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রের সম্পাদক সুরাপানের মতো জঘন্য কাজের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন এখানে এ ধরনের পাপ কাজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এদেশ ব্রিটিশ শাসনের হস্তগত হলে নানা প্রকার পাপাচার চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পূর্বে যখন এই ভারত ভূমি স্বাধীনতা সুখে পরিপূর্ণ ছিল তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন, রাজদণ্ড ও লোকের অপবাদের ভয়ে সুরাপানের মতো পাপকাজে কেউ জড়িত হতে পারেনি। কিন্তু যখন এদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো তখন থেকেই দেশীয় রাজার অভাবে ধর্মের শাসন ক্রমশ দুর্বল হতে লাগলো। আর সে কারণেই এদেশীয় প্রজারা সুরাপানে ভয়ানক মূর্তি ধারণ করেছে (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৬ আগস্ট ১৮৫০)। সুরাপান বা মদ্যপান বিষয়ে সংবাদপত্রটি থেকে আমরা আরোও জানতে পারিঃ

> সুরাপানের মত ভয়ঙ্কর পাপরূপ পিশাচের দমনের জন্য রাজার শাসন ভিন্ন আর অন্যপথ নাই। বাস্তবিক আমরা অনেকেই প্রথার দাস, কোন এক প্রথা প্রচলিত হইবামাত্রেই অমনি তাহার অনুবর্ত্তি হই, সে প্রথা ভাল কি মন্দ তাহার কিছু মাত্র বিবেচনা করি না, পরে যখন তাহার ফল ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রথার দোষ গুণ জানিতে পারি। সুরাপান আমাদিগের প্রাণনাশ, শরীর জীর্ণ, শ্রীভ্রষ্ট, মানহানি এবং নানা প্রকার অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া ঐহিক পারত্রিক উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রজারা অনাহারে ক্লেশই ভোগ করুক, আর মত্ততা জন্য নানা প্রকারে বিনষ্টই হউক, তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরের কি (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৬ আগস্ট ১৮৫০)?

রাজনীতি বিষয়ক *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের* আদর্শিক চিন্তা ও মতাদর্শ

রংপুর থেকে প্রকাশিত *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রে রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। জমি, জমিদার ও কৃষক সম্পর্কে পূর্ববাংলার সংবাদপত্রগুলোতে প্রায় সবসময়ই কোনো না কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতো। মধ্যশ্রেণি সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলোতে প্রজার ওপর জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জমিদার ও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও অনাচারের ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তাদের হাত হতে পরিত্রাণের জন্য জনগণ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অমঙ্গল কামনা করেছিল।

(ক) ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা

উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে লক্ষ করা যায় যে, অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদক জমিদারী প্রথার সমর্থক হলেও তাঁরা প্রজার ওপর অত্যাচারের বিরোধীতা করতে সংকোচবোধ করেননি। হিন্দু ও মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হলে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্রে আক্ষেপ করে বলা হয়েছিল যে, 'হায়! বিধাতা! আমরা তোমার কি সর্বনাশ করেছিলাম যে তুমি পূর্বের শাসকদের সকল বংশ নিপাত করে এ স্বার্থতৎপর পাপিষ্ঠ রাজার অধিনে আমাদেরকে স্থান করে দিয়েছো। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধিকারভূক্ত হওয়াতে বিলাতবাসীদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে দেশের মাধ্যমে তাদের এতো উন্নতি সাধিত হয়েছিল সে দেশের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের অযত্ন ও অবহেলা ভারতীয়দের ব্যতীত করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের উচিত দেশীয় জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই ভারতবর্ষের শোষিত জনসাধারণ বিধাতার নিকট ঔপনিবেশিক শাসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এ প্রার্থনাই করেছিল। তাছাড়া তাদের মুক্তির আর কোনো পথ ছিল না (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ,* ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫১)।' এ প্রসঙ্গে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় আরোও উল্লেখ করা হয়েছে:

> আমারদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট রাজনীতিজ্ঞ নহেন, কিন্তু সংপূর্ণ নীতিজ্ঞ হইয়াও শুদ্ধ এক অবৈধেয় ধন লালসায় প্রজাবর্গের অপ্রিয় হইয়াছেন, এক্ষণে প্রজাদিগের মনে এরূপ বিরাগ জন্মিয়াছে যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নাম শুনিলেই মহাভারত মহাভারত এমত প্রবঞ্চক আত্মসাধন রাজা কি আর আছে? বলিয়া কর্ণে করার্পণ করেন। গবর্ণমেন্ট প্রথম প্রথম সুবিচার দ্বারা এদেশের লোকদিগকে যেমন সুখী করিয়াছিলেন, অধুনা তেমতি অনেকানেক বিষয়ে প্রজাদিগকে অসুখী করিতেছেন, ইদানিং গবর্ণমেন্টের চাতুর্য্যের অনেকাংশ প্রজারা বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব প্রজাদিগের অন্তকরণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি আর তেমন ভক্তি নাই, প্রজারা নিশ্চয় জানিয়াছেন গবর্ণমেন্টের যত কল কৌশল সকলি প্রজার ভিটে মাটি উচ্ছিন্ন করিবার সোপান মাত্র (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৬ আগস্ট ১৮৫০)।

হে জগদীশ্বর! তোমার ভারতবর্ষস্থ প্রজাদের প্রতি কি তুমি এককালীন স্নেহ শূন্য হয়ে তাদেরকে কেবল রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অসভ্যতা ও অজ্ঞানতাকে আবৃত করে বিদেশী শাসন গ্রহণপূর্বক তাদের অধীনতা স্বীকার করাতেই একান্ত মনস্থ করেছো? বোধ হয়, এরা যে তোমার কুপুত্র হবে তা পূর্বেই তুমি জেনেছিলে। নতুবা অসভ্য ব্যক্তিদেরকে সভ্যতা প্রদান দ্বারা আমাদেরকে কেন লাঞ্ছনা প্রদান করাবা? কিন্তু নিশ্চয় জানবেন যে, তাতে কোন ফলদয় হবার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু তাদের শরীরে বিবেকের বীজমাত্র নেই, সেহেতু তাদেরকে অধিক পরিমাণে অপমান করলেও তাদের শরীরে বীজ উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ,* ৬ আগস্ট ১৮৫০)। ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গের প্রথম পত্রিকা *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* যে সংবাদ প্রচার করেছিল তা হলো:

> আমাদের এই মহা হতভাগ্য দেশ ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি রাজার শাসনাধীন হওয়াতে নানা দিক দিয়ে আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যে কত লাঘব ও দুঃখের প্রবাহ যে

> কত বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বর্ণনা করে ওঠা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। যে দেশ যত দিন ঐ বিদেশী শাসনের অধীনে থাকবে সে দেশকে তত দিন স্বাধীন নয় এ শব্দে আখ্যাতিয় করা যায়। কালে দেশস্থ লোকদের দুভার্গ্যবশতঃ যদি তাতে ভিন্ন মতাবলম্বি রাজার কর্তৃত্বের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে যে সেখানকার প্রজাদেরকে কি অসীম বিড়ম্বনার দাসত্ব স্বীকার করতে হয় তা বোধ করি হিন্দুস্থানের প্রজাদের ন্যায় অন্য কোনো দেশের প্রজারাই এত অনুভব করতে পারেনি। আমাদের বিদ্যা শিক্ষার অভাব হেতু এটাই প্রমাণিত হয় (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৬ আগস্ট ১৮৫০)।

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে সরকার জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক এবং কৃষককে তাঁর অধিনস্ত প্রজায় পরিণত করেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, জমিদার প্রজাকে খাজনা অনাদায়ের জন্য দৈহিক নির্যাতন করতে পারবেন না এবং দৈহিক নির্যাতন করলে প্রজার অধিকার থাকবে জমিদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার (ইসলাম, ২০১৩: ১২৬)। সমসাময়িককালে জমিদাররা জমির ওপর নির্ভরশীল হলেও জমির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ জমিদারীতে তাঁরা ছিলেন অনুপস্থিত। যেহেতু জমিদারীতে তাঁদের কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা ছিল না এবং প্রজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের একতরফা অর্থাৎ শুধু নেওয়ার, সেজন্য জমিদারদের জমিদারীতে অনুপস্থিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। জমিদারদের অনুপস্থিতির ফলে প্রজার সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এ সংক্রান্ত তথ্য আমরা *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ* পত্রিকা থেকে জানতে পারি। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে:

> অধুনা জমিদারদিগের সহিত প্রজার এইরূপ অসঙ্গত অর্থ সম্পর্ক থাকাতে, এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কৃষকদিগের হস্তে ভূমির সত্ত্বাধিকার নাই, এই বলিয়া আর কোন চাষাই বিশেষ উৎসাহ সহকারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না। তাহারা মনে করিতেছে আমরা যখন শ্রম করিয়া ফলভোগে সক্ষম নহি, আমাদিগের উপার্জ্জিত দ্রব্যের অধিকাংশই যখন জমিদারদিগের মনতুষ্টিতে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা তজ্জন্য সমধিক যত্ন করিব কেন? কর্ণওয়ালিস যেমন জমিদাদিগের সহিত গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বাংশের শৃঙ্খলা সাধন করিয়াছেন, লর্ড বাহাদুরও সম্প্রতি তাঁহাকে স্বরণ করিয়া সেইরূপ এতদ্দেশীয় দুর্ব্বল প্রজাদিগের সহিত জমিদারের একটি স্থির বন্দোবস্ত সংস্থাপনে যত্ন করুন। তাহা হইলে আর জমিদারেরা অত্যাচার করিয়া কোনরূপ প্রজার অর্থ শোষণ করিতে পারিবেন না, প্রজারাও নিব্বিঘ্নে স্বাধীনতার সহিত অনুদিন কৃষির উন্নতি করিয়া দেশের সাময়িক অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইবে (*রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে জমিদার ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারী। কারণ জমিদার তখনও নিজ জমিদারীতে অবস্থান করছিলেন। সাহিত্যে ঐ সময় জমিদারকে দস্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) লিখেছিলেন- 'বাঙালি কৃষকের শত্রু বাঙালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৭: ২৯১-২৯৪)।' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার তাঁর জমিদারীর মালিকানাস্বত্ব লাভ করেন এ শর্তে যে, তিনি তাঁর জমিদারীর নির্ধারিত স্থায়ী রাজস্ব যথাসময়ে সরকারকে পরিশোধ করবেন। তাঁর দেয় রাজস্ব পরিশোধ করে তিনি

আইনসঙ্গতভাবে প্রজাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ও খাজনা যতটা সম্ভব আদায় করতে পারবেন এবং তা ভোগও করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে রজনী পাম দত্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ইংল্যান্ডের ভূস্বামীগোষ্ঠীর অনুকরণে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভরূপে একটি নতুন ভূস্বামীশ্রেণির সৃষ্টি করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য। শাসকগণ বুঝিয়াছিলেন যে,ইংল্যান্ডে যেমন অল্পসংখ্যক লোক (ভূস্বামী) বিপুল জনসংখ্যাকে দমন করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপ ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসনের একটি সামাজিক ভিত্তি (সমর্থন) গঠনের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন- যে শ্রেণি ভূসম্পদের একাংশ (মূল পরিকল্পনানুযায়ী এক দশমাংশ) ভোগ করিয়া ইংরেজ শাসনের সহিত সমস্বার্থ-সম্পন্ন হইবে এবং এই শাসনকে চিরকাল রক্ষা করিবে (Dutt, 1949: 217-218) ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার জমিদাররা যখন সরকারি রাজস্বের কন্ট্রাক্টারে পরিণত হলেন, তখন দেখতে দেখতে তাঁদের অধীনে নানাশ্রেণির সাব-কন্ট্রাক্টর গজিয়ে উঠতে লাগলেন। উপরের জমিদার ও নিচের কৃষকদের মধ্যে একটি বিশাল মধ্যস্বত্বভোগীর দল বা উপশ্রেণির সৃষ্টি হয়। সেকালের সাময়িকপত্রে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছে- কোন বছর শস্য হোক বা না হোক তাঁরা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও ছাড় দিতেন না। এছাড়া ইজারাদার, পত্তনিদার ও দরপত্তনিদার ইত্যাদি বহুলোকে কৃষকের পরিশ্রমে উপার্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ উপার্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় কষ্টদায়ক হয়েছে (*সংবাদ প্রভাকর*, আগস্ট ১৮৫২)। এতদসংক্রান্ত *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় আমরা যে তথ্য পাই তা নিম্নে বর্ণিত হলো:

> আমারদিগের মহারাজ সরকার বাহাদুরের ভৃত্য বর্গের মধ্যে সাধু লোক অতি অল্প পাওয়া যায়, বিষেশতঃ উচ্চ সোপান হইতে যতই আমরা নিচে অবতরণ করি, ততই অসাধু লোকের আধিক্য দেখিতে পাই। সরকারের কোন শেরেস্তাদার ক্ষুদ্র চাকর বর্গই সাধুশীল নয়, এতাবতা তাহার মধ্যে এমন ব্যক্তিই নাই যে তিনি ছলে, বলে, কলে, বাদী, প্রতিবাদী ইত্যাদি লোকের নিকট হতে পয়সা না কুড়ান। এক তো আমাদের অর্থশোষক মহাজের আইন কানুনের লেখাপড়া খরচ যোগাইতেই প্রজারা এক শেষ উত্যক্ত হয়, তাহার ওপর আবার চেলাদিগের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকিতে হয় (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৫০)।

(গ) প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ নিয়ে সমালোচনা

পূর্ববাংলার অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারের যেকোনো ধরনের করারোপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। অন্তত এই একটি বিষয়ে সম্পাদকরা কখনো দ্বিমত পোষণ করেননি। যখনই সরকার নতুন কোনো করারোপ করতে চেয়েছেন তখনই সব সংবাদপত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষের জমিদার মৃত বাবু দ্বারকানাথ রায়ের জমিদারীর বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিধবা স্ত্রীর খাজনার হার বৃদ্ধির চেষ্টাই নাকি এ আন্দোলনের মূল কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যবস্থার স্থায়ী বন্দোবস্ত না হচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অসন্তোষ দূর হবার সম্ভাবনা ছিল না (*সোমপ্রকাশ*, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮২)। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্র 'রাষ্ট্র, ভূস্বামী ও প্রজা' শিরোনামে ৩০ মে ১৮৪৮ সালে কোম্পানির স্ট্যাম্প আইনের সমালোচনা করে যে মত প্রকাশ করে তা নিম্নরূপ:

> আমারদিগের এ লিখাতে যদি কেহ বলে যে কোন মন্দ আইন প্রকাশ হইলে অবশ্যই তাহাতে আপত্তি হইত কিন্তু তদুত্তর আমরা এই দেই যে ১৮৪১ সালের দ্বাদশ আইন প্রভৃতি যে সকল আইন দ্বারায় বহু লোকের অনিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আইন কর্ত্তারদিগের

> বিবেচনায় অপকারজনক হইয়া রহিত হইয়াছে তাহাতেই বা কে কোন আপত্তি করিয়াছিলেন, এতদ্দেয় বুঝিবার শক্তি আছে তাহারাও কেবল আর্ত্তনাদমাত্র করেন অর্থাৎ ঘরে বসিয়াই আক্ষেপ করেন যে কোম্পানি বাহাদুর কাহারও কিছু রাখিলেন না, নানা প্রকার কৌশলে এদেশের অর্থ শোষণ করিলেন ইত্যাদি যতই বকেন তাহার সীমা নাই কিন্তু তাহা লিখিয়া যে বিচার্য কর্ত্তার নিকট বিচার প্রার্থনা করিবেন যে বিষয়ে কাহারও চেষ্টা নাই বরং তদ্বিষয়ে কাগজ কলম একত্র করিতে হইলেই মাথায় যেন বজ্র পরিবেক এমত জ্ঞাপন করেন। অতএব আমরা অনুরোধ করি গভর্ণমেন্ট অর্থ শোষণ পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টির খর্ব্ব করুন (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৩০ মে ১৮৪৮)।

কৃষকের বাড়তি সম্পদ আত্মসাৎ প্রক্রিয়ায় সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে জমিদার শ্রেণি। মোগল আমলে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে পরগনার খাজনার হার এবং পরগনার রীতি ছিল একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সরকার প্রতিটি পরগনার উৎপাদন শক্তি জরিপ করে যে রাজস্ব হার ঠিক করতো সে হার ছিল ঐ পরগনার জন্য প্রচলিত রীতি। ঐ রীতি লংঘন করার অধিকার জমিদারেরও ছিল না। কিন্তু কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ পদ্ধতির অবসান ঘটে। কোম্পানি কর্তৃক বিধি বহির্ভূত অতিরিক্ত করারোপের ফলে রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল (ইসলাম, ২০১৩: ৩২৭-৩২৮)। এ প্রসঙ্গে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রিটিশ সরকারের রাজকর যেরূপ প্রজাপীড়ক পূর্বের রাজাদের এরূপ ছিল না। ভারতবর্ষের ভূমিই কেবল রাজকরের উৎস হয়েছে পূর্বের রাজাদের সময়ে রাজস্বের নিয়ম এরূপ স্থাপিত ছিল যে তা জমিদার কি রায়ত কারো প্রতি কষ্টকর ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রাজকরের এরূপ বৃদ্ধি করেছেন যে তাতে এদেশীয় জমিদার এবং প্রজাবর্গ নিঃস্ব হলেন (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ১৭ অক্টোবর ১৮৪৮)।

শিক্ষা বিষয়ক জনমতের প্রতিফলন

(ক) ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিষয়ক মনোভাব ও শিক্ষা নীতি

ইংলিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৮১৩ সাল পর্যন্ত দেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে দেশিয় সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে এবং জনগণ এতে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ভারতীয়দেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুললে তারা আত্মসচেতন হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পাবে (*Report of the Bengal Provincial Committee*, 1884: 3)। ব্রিটিশ শাসকেরা প্রথম দিকে ভেবেছিল যে শিক্ষার ওপর হস্তক্ষেপ করলে ভারতীয় জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরদের একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা দিলে আমেরিকায় ব্রিটেনবাসীর যে অবস্থা হয়েছিল ভারতেও সেরূপ ঘটবে (Mahmud, 1895: 2)। তাই ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে শিক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চাইলেও অন্তিমে অনেকাংশে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল শিক্ষার ভার বহন করতে। এ প্রসঙ্গে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে:

> এতদ্দেশীয় প্রজাবর্গকে বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাহারা দূরদর্শী হইবে, এবং তাহাতে এমন আশঙ্কাও হওয়া সম্ভব যে প্রজারা চালাক চতুর হইলে কালে তাঁহারা আমাদিগের উপরে প্রাধান্য করিতে পারিবেন না। পরে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের সে কদভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে সুশিক্ষিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু আমারদিগের দূরদৃষ্টবশতই হউক, অথবা তাঁহারদিগের বিবেচনার ত্রুটি কিংবা ব্যয়কুণ্ঠতা দোষেই হউক, সে কর্ত্তব্য কার্য্যও এ পর্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে দৃষ্ট হইল না, আদৌ তদ্বিষয়ক ব্যয় কল্পে সরকার বাহাদুরের কুণ্ঠতা, দ্বিতীয় আমারদিগকে আমারদের স্বদেশীয় ভাষাতে সুশিক্ষিত করিতে তাঁহারদিগকে অনাস্থা ইত্যাদি হেতুতেই এ

> বিষয়ে গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার ভাজন হইতে পারেন নাই (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ৯ জুলাই ১৮৫০)।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি নির্ধারণে টমাস বেবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) অনেকটা সাহায্য করেছিলেন। তাঁর নীতির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য নয়, বিশিষ্ট শ্রেণির জন্য। প্রাচ্য-বিদ্যার প্রতি তাঁর অবজ্ঞার শেষ ছিল না, তিনি মনে করতেন 'যেকোনো ভালো ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের এক থাক বই সমগ্র ভারতীয় ও আররি সাহিত্যের সমতুল্য (Macaulay, 1835)।' তিনি আরোও বলেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি হবে। এতে করে ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটি শ্রেণি তৈরি হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু চিন্তাধারা, নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে পড়বে। এরা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আনুগত্য বজায় রাখবে (Mollick, 1961: 168)।

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে উইলিয়াম অ্যাডাম (১৬৮৯-১৭৪৮) বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫ সালে বাংলা ও বিহারের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে তার ওপর রিপোর্ট প্রদান করার জন্য উইলিয়াম অ্যাডামকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এর মধ্যে অ্যাডাম তিনটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার করুণ ও মর্মান্তিক চিত্র ঐসব রিপোর্টের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় জমিদারের অবস্থা বিপর্যয়ের দরুণ, দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোটায় গিয়ে ঠেকে। তাঁর মতে, সকল ভাষা ও ধর্মের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং সকলের মঙ্গল সাধিত হবে (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৪ জুন ১৮৫১)। ইংরেজদের শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকা লিখেছিল:

> ইংরেজদিগের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী আমারদিগের বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বোধ হয়। যেহেতুক সুশিক্ষিত একজন ইংরেজকে যে কোন কর্ম্মে আবাহন করা যায়, তাহাই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমারদিগের দেশস্থ ভ্রাতারা সাংসারিক অধিক কর্ম্মে অনভিজ্ঞ হওয়াতে প্রায় অনেক কার্য্যেই তাহারদিগকে কেহ ডাকে না। আর সময় মত যে যে কার্য্যে তাঁহাদের ডাক হয়, প্রায় তাহার অনেক কার্য্যই ইহাঁরদিগের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত হওয়াতে তাহাতে অগ্রসর হইতে সাহস পায়েন না (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৪ জুন ১৮৫১)।

উনিশ শতকে রংপুর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে সাধারণত শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাই বেশি লক্ষ করা যায়। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের এ মফঃস্বল প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহী বালদের নিয়ে স্কুল স্থাপন করার ভরসা অতি অল্পতো বটেই, মোটেই নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, সেকালে বিদ্যালয়গুলোতে বালকের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জেলার জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। এমনকি ছাত্রদের নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয় প্রধানদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রটি থেকে জনমতের যে প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

> স্কুলে বালকের অপ্রতুল। আমরা শুনিলাম যে, রঙ্গপুরের জমিদার মহাশয়দিগের স্থাপিত স্কুলে এই ক্ষণে ১৫/১৬ উর্দ্ধ সংখ্যা ২০টি বালকের অধিক হাজির নাই। হওয়ারই বা সম্ভব কি? এক তো এ রংপুর জেলাতে ভদ্রলোকের বসতিই অতি বিরল, তাহাতে আবার বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এ জেলার লোকদিগের উপযুক্ত মত প্রয়াস নাই। চারিদিক দিয়াই প্রতুল ঘটিয়াছে, ইহাতে স্কুলের উন্নতি কিরূপে হইবে? আমরা রঙ্গপুরের জমিদার মহাশয়দিগের

> মহাত্মা গুণের কত বর্ণনা করিব? যে কালে এই মফঃসল প্রদেশের কোন স্থানে ইংরেজী স্কুল না হইয়াছিল, সেই কালে ইহারা চান্দা দ্বারা বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত স্কুল স্থাপন করিয়া আপনাদিগের মহা এক কীর্ত্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর হইতেই আমরা এথাকার বিদ্যার্থিদিগের শিক্ষার প্রতি উৎসাহের তন্ত্রতা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ২৪ জুন ১৮৫১)।

(খ) স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

সমাজের অর্ধাংশকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখাটা যে ঠিক নয়-উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই সচেতন কিছু মানুষ তা অনুভব করতে শুরু করেন। তাঁরা মেয়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১)। তিনি এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন (শাস্ত্রী, ১৯৫৭: ১৬৯)। স্ত্রী শিক্ষায় আগ্রহী বিভিন্ন ব্যক্তির চেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ বিদ্যালয়গুলোতে যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার অধিকার আছে এবং লেখাপড়া শিখলে যে তাতে ক্ষতি নেই- এ বোধ অন্তত কিছু পরিমাণে জনসাধারণের নিকট তারা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকাটি একসময় স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীতা করলেও পরবর্তীতে সমাজের একটি বড় অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলে সমাজ যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না তা অনুধাবণ করে স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এ প্রসঙ্গে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে:

> বালিকারা ঘোরান্ধকারে রক্ষিতা হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রথা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি বা শাসনক্রমে হইয়াছে এমত নহে। বরং যাঁহারা কিছু কিছু ব্যয়পূর্ব্বক শিক্ষক নিযুক্ত করিতে সক্ষম তাঁহাদিগের পরিবারের মধ্যে কিঞ্চৎ কিঞ্চৎ শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। এই নিয়মানুসারে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা প্রদত্ত হওয়া অসাধ্য, তাহাতে কৌন্সেলের বোধ হইয়াছে স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বাধা নাই। কিন্তু দেশে চলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে যে প্রকার নির্জ্জনে রাখিতে হয়, বিদ্যালয়স্থ বালিকাদিগকে তদ্রুপাবস্থায় রাখা আবশ্যক। গবর্ণর জেনরল কৌন্সেলের আরো বাসনা এই যে মফঃসলস্থ প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিবেন যে তাহারা আপন আপন অধিকারস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে অভিপ্রায় অবধারণ করিবেন। তাহা স্থাপন করাইতে কেহ কেহ বাসনা করিলে তদর্থে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং জানাইবেন যে গবর্ণমেন্ট স্ত্রীশিক্ষালয়ের শুভাষণে বিশেষ যত্নশীল আছেন (*রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*, ১৬ জুলাই ১৮৫০)।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এ ধরনের কুসংস্কারও অনেকের মধ্যে ছিল। যে দেশে একদিন গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীরা উপনিষদাদির আলোচনা করে ভারতে ব্রহ্মজ্যোতি ছড়িয়েছিলেন। খনা ও লীলাবতী জ্যোতিষ ও গণিতের আলোক ছড়িয়েছিলেন সে দেশে এমন সংস্কার কেমন করে দৃঢ়মূল হয়েছিল তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। এক পর্যায়ে গোড়া রক্ষণশীল সমাজের ভেতরেও স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র পল্লীতেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগলো। ক্রমে এমন এক সময় আসলো যেখানে বিবাহের সময় কন্যার শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হলো (সেহানবীশ, ১১৭)। স্ত্রীরা শিক্ষা-দীক্ষায় সে সময়ে স্বাভাবিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। ধর্মীয় কারণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীতা করেছে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) উল্লেখ করেন যে, এ সময় বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো। কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো যে, এর ফলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। অবশ্য অ্যাডাম

অভিজাত হিন্দু-মুসলিম পরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। হিন্দু নারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এমন উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হতো না (James, 1868: 132-133)। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অনুধাবণ করে তৎকালিন *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা যেভাবে হোক আমাদের সাধ্য অনুসারে আপন আপন পুত্রসন্তানদেরকে বিদ্যাশিক্ষা করাচ্ছি। কন্যাদের কি অপরাধ যে তাদেরকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে চিরকাল দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখবো। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করে সকলের সামনে শোনাতে পারি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করতে নেই এরূপ মতের পক্ষে কেউ কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন না (বসু ও বেদান্তবাগীশ, ১৮৭৩: ২০৫)।

উপসংহার

উনিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের কাল হিসেবে বিবেচিত হলেও এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন যে সংবাদপত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় তার নাম *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় হতে পত্রিকা প্রকাশের এই প্রচেষ্টাকে একটি বিরল ঘটনা বলে অভিহিত করা যায়। বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জেলা রংপুর থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রটিতে তৎকালিন সময়ে জনমতের যে প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, বাল্যবিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক এবং সুরাপান বা মদ্যপানের বিরোধীতা করে সে সময়ে সংবাদপত্রে জনমত গঠনের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা থেকে শুরু করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রজাসাধারণের ওপর অতিরিক্ত করারোপের ফলে তাদের জীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তা সংবাদপত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বশেষ শিক্ষা বিষয়ক যে মনোভাবের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা নীতির পাশাপাশি স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন খবরাখবর প্রচার করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের যেসকল পণ্ডিত ব্যক্তি এ সংবাদপত্র প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন। সংবাদপত্র প্রকাশের এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা রংপুরের সার্বিক বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ হেতু তাঁদের সে প্রচেষ্টা এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তথা উত্তরবঙ্গ যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল তা বললে হয়তোবা খুব একটা বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না।

তথ্য নির্দেশিকা :

জাহান, এমরান, ২০০৮, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল, ২০১৩, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, চয়নিকা প্রকাশনী, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল, (সম্পা.), ২০১১, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

ঘোষ, বিনয়, (সম্পা), ২০১৬, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, চতুর্থ খণ্ড,*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, প্রকাশ ভবন, কোলকাতা।

চক্রবর্তী ও খাঁ, ড. রতন লাল সুশান্ত চন্দ্র (সম্পা.), ২০০১, *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* (১৮৪৮-১৮৫১) ভূমিকা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৭, 'বঙ্গদেশের কৃষক', *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা।

দেবী, কৈলাসবাসিনী, উদ্ধৃত, ১৮৬৩, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, গুপ্ত প্রেস, কোলকাতা।

পাল, তারাপদ, ১৯৭২, *ভারতের সংবাদপত্র*, ১৭৮০-১৯৪৭, সাহিত্য সনদ, কোলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৯৭২, *বাংলা সাময়িক-পত্র*, ১৮১৮-১৮৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৯৩৭, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (১৮১৮-১৮৩০), ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা।

বসু ও বেদান্তবাগীশ, উদ্ধৃত, রাজনারায়ন আনন্দচন্দ্র (সম্পা.), ১৮৭৩, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী*, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কোলকাতা।

মামুন, মুনতাসীর, ২০০০, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫) প্রথম খণ্ড, অনন্যা, ঢাকা।

রায় চৌধুরী, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র, ১৯২৪, 'পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর', *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*।

শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯৫৭, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা।

সেহানবীশ, শ্রী বিপিনমোহন, 'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'।

Barns, Margarita, 1940, *The Indian Press*, George Allen & Unwin Ltd., UK.

Chanda, Mrinal Kanti, 1987,*History of English Press in Bengal*, 1780-1852, K.P Baghi & Company, Calcutta.

Chakraborti, Smarajit, 1976, *The Bengli Press, 1818-1868, A Study in the Growht of Public Opinion*, Firma

KLM Private Limited, Calcutta.

Dutt, Rajani Palme, 1949, *India Today*, People's Publishing House, Bombay.

Macaulay,Thomas Babington *Minute on Indian Education*, 2nd February, 1835.

Mahmud, Sayed, 1895, *History of English Education in India* (1781-1893), Aligarh.

Mollick, Azizur Rahman, 1961, *British Policy and the Muslims in Bengal* (1757-1856), Asiatic Society of Pakistan, Dacca.

Vas, J. A, 1911, *Eastern Bengal and Assam district Gazetteers*, *Rangpur*, Printed at the Pioneer Press, Allahabad.

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ৩০ মে ১৮৪৮।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ১৭ অক্টোবর ১৮৪৮।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ৯ জুলাই ১৮৫০।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ১৬ জুলাই ১৮৫০।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ৬ আগস্ট ১৮৫০।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ২৯ অক্টোবর ১৮৫০।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৫০।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ২৭ মে ১৮৫১।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ২৪ জুন ১৮৫১।

সংবাদ প্রভাকর, আগস্ট ১৮৫২।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯।

সোমপ্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮২।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯১৫, ১ম সংখ্যা।

Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar, Submitted to the Governent in 1835, 1836 and 1838 with a brief view of its present conditions, Home Secretariat Press, Calcutta.

Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee, 1884.

Friend of India, 1826, iv.

Report of W. Dompier, S.P 1853, *Selections from the Records of the Bengal Government*. No XXII, Calcutta.

[**Abstract :** Newspapers are said to be repositories of knowledge. There is nothing related to human life that is not described in it. The name of the first newspaper of East Bengal and Bangladesh is *Rangopur Bartabaho*. This newspaper was published in August 1847 from Rangpur, an important district in the northern part of present-day Bangladesh. The publication of the newspaper continued for a long time under the patronage of the zamindars. But the publication of *Rangopur Bartabaho* was stopped in 1857 due to the issuance of the British Government's Printing Act, bound by various restrictions. *Rangopur Bartabaho* newspaper reflected public opinion in contemporary society, politics and education. In the mentioned article, an attempt has been made to present the original newspaper of Bangladesh and the reflection of public opinion observed in it on various issues.]